টক অফ দ্য টাউন!

মোঃ নজরুল ইসলাম (বিপুল)

সামাজিক, প্যারানরমাল, সাসপেন্স-থ্রিলার
ছোট গল্প।



চেনা সুর প্রকাশনী

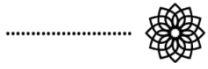
টক অফ দ্য টাউন!

মোঃ নজরুল ইসলাম (বিপুল)
গ্রন্থ স্বত্বঃ লেখক
প্রথম সংস্করণ
১৯ মাঘ ১৪৩২/১লা ফেব্রুয়ারী ২০২৬ ইং
প্রকাশনায়ঃ
চেনা সুর প্রকাশনী
প্রধান কার্যালয়ঃ জামিরদিয়া মাষ্টারবাড়ি, ভালুকা ময়মনসিংহ।
শাখা অফিসঃ নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫
মোবাইলঃ ০১৬৩০৯১৬৬৪৪
প্রকাশকঃ
এন, আই, বিপুল।
প্রচ্ছদঃ
মো: জহিরুল ইসলাম জহির।
পরিবেশকঃ
ছায়া প্রকাশন, উচ্ছ্বাস প্রকাশনী,
প্রহেলিকা প্রকাশনী।
অনলাইন পরিবেশকঃ
রকমারি ডট কম
মুদ্রণ ও বাঁধাইঃ
দি মোকাদ্দাস এন্ড ব্রাদার্স ২৮/১, রূপ চান লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মূল্য ২৫০ টাকা
ISBN: 978-984-29141-0-2

"Talk of the town" by MD Nazrul Islam (Bipul)
Published by N I Bipul. Chenasur prokashoni. Head Office: Jamirdia master bari, Valuka, Mymensingh. Branch Office: Nilkhet Dhaka1205. Price 250 Taka To purchase online www.rokomari.com chenasurprokasoni@gmail.com ISBN: 978-984-29141-0-2

উপহার

নাম.....।
ঠিকানা.....।
মোবইল.....।



উপহার দাতা

জনাব.....এর পক্ষ থেকে আপনার জন্য **টক অফ দ্য টাউন** উপহার।

সাক্ষর

উৎসর্গঃ

যাদের স্নেহ, ভালোবাসা ও আশীর্বাদে আমি আজকের এই অবস্থানে, আমার সেই শ্রদ্ধেয় বাবা-মায়ের চরণে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করলাম।



Chena Sur
PROKASHONI

লেখকের কথা

সুপ্রিয় পাঠক/পাঠিকা,

আমার এই গল্পগ্রন্থ **"টক অফ দ্য টাউন"** আপনাদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এই বইয়ের প্রতিটি গল্প আমার জীবনের নানা সময়ের প্রতিচ্ছবি। কিছু গল্প আমার নিজের অভিজ্ঞতার ফসল, আবার কিছু গল্প আমার বাবা এবং সহকর্মীদের কাছ থেকে শোনা। তাদের জীবনের নানা ঘটনা এবং অভিজ্ঞতা আমাকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছে।

এই "টক অফ দ্য টাউন"-এ আপনারা খুঁজে পাবেন জীবনের নানা রং, নানা সুর। এখানে যেমন আছে আনন্দ-বেদনার গল্প, তেমনি আছে হাসি-কান্নার গল্প। আছে হাড় হিম করা কিছু মূহুর্তের স্মৃতিচারণ। জীবনের জটিলতা, মানুষের সম্পর্ক, সমাজের নানা দিক-এসব কিছুই এই গল্পগুলোতে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আমি বিশ্বাস করি, জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই মূল্যবান এবং প্রতিটি ঘটনার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে গভীর অর্থ।

এই গল্পগুলো লিখতে গিয়ে আমি যেমন আনন্দ পেয়েছি, তেমনি অনেক কিছু শিখেছি। আশা করি, আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস আপনাদের ভালো লাগবে এবং আপনাদের মনে কিছু চিন্তার খোরাক জোগাবে। আপনাদের মূল্যবান মতামত আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সবশেষে, বইটি প্রকাশের পেছনে যারা আমাকে সহযোগিতা করেছেন, তাদের প্রতি রইলো আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। বিশেষ করে আমার বাবা, তিনি যেন অভিজ্ঞতার এক বিরাট ভান্ডার! যেখান থেকে আমি প্রতিনিয়তই সমৃদ্ধ হই।

শুভেচ্ছান্তে

মোঃ নজরুল ইসলাম (বিপুল)

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	নাম	পৃষ্ঠা নং
০১	নিশি উপহার	০৭
০২	কাজলী	১৩
০৩	তথাপি	১৯
০৪	নিঝুম রাতের অতিথি	২৩
০৫	রহস্যময় ক্লাউন	২৭
০৬	প্রায়শ্চিত্ব	৩২
০৭	সেই ভয়াল রাতের কথা	৩৬
০৮	টক অফ দ্য টাউন	৪০
০৯	সাদা মনের কালো মানুষ	৪৪
১০	শীতল রক্তচক্ষু	৫১
১১	বরফ শীতল স্পর্শ	৫৬
১২	নাগীন	৫৯
১৩	কে ওখানে?	৬৩
১৪	আমার বন্ধু মাহফুজ	৬৮
১৫	মিসক্যারেজ	৭২
১৬	রহস্যময় ডায়রি	৭৭
১৭	অদম্য	৮২
১৮	এই নাড়ি নারী না	৯১
১৯	অনিশ্চয়তার কালো রাত	৯৮
২০	ধুসর প্রান্তরের কান্না	১০৪
২১	তেতৈয়ার আতঙ্ক	১১২
২২	সেদিন কি হয়েছিল আমার?	১১৭
২৩	কপালের ফেরে	১২০
২৪	শেষ ট্রেণের যাত্রী	১২৫
২৫	ডায়রীর পাতা থেকে	১২৮
২৬	প্রকৃতির নীরব বার্তা	১৩৩
২৭	ঝাঁকি জাল	১৩৮

নিশি উপহার

রাত প্রায় দুইটা বাজে। রাত্রিকালিন রিক্সা চালক লতিফ, তীর্থের কাকের মত পূর্বদিকের রাস্তাটার দিকে চেয়ে আছে। এই পথেই ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা দূরপাল্লার গাড়ি গুলি আসে। স্ট্যান্ডে গাড়ি পৌঁছানোর পরেই, ক্লান্ত যাত্রী গুলি নেমে হন্তদন্ত হয়ে বাড়ীতে পৌঁছার রিক্সা তালাশ করে। বেশিরভাগই ব্যবসায়ী ও চাকরিজীবী যাত্রী গুলি রিক্সা ভাড়া নিয়ে দরদাম করে কম। তাছাড়া রাত্রিকালীন ভাড়াও থাকে দ্বিগুণ। তাই অল্প পরিশ্রমে বেশি রোজগার করা যায়। মূলত এই কারণেই লতিফ ইদানিং দিনের পরিবর্তে রাত্রে রিক্সা চালানো শুরু করেছে। তাছাড়া দিনের বেলা পুরনো শহর নওগাঁর এই অলিগলিতে প্রচুর জ্যাম লেগে থাকে। একশ থেকে দেড়শ টাকা রোজগার করতে দুপুর গড়িয়ে যায়। সবকিছু চিন্তা করে লতিফ রাত্রে রিকশা চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। শ্রাবণের প্রথম সপ্তাহ, প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে।সে রিক্সা একসাইডে পার্ক করে রেখে, বন্ধ থাকা দোকানের সামনের বেঞ্চে বসে, যাত্রী অপেক্ষায় রইল।

আজকে তেমন ভাড়া পায় নাই সে। অবশ্য বাড়ি থেকে বের হতেই একটু দেরি করে ফেলেছে। সে স্ট্যান্ডে আসার পর দুইটা গাড়ি এসেছিল। এখন পর্যন্ত তিনটি খ্যাপ মেরে, একশত পঁয়ত্রিশ টাকা ইনকাম করেছে। মাথায় রাজ্যের চিন্তা। এই টাকায় কি হবে। গাড়ির মালিককেই তো জমা বাবদ দেড়শ টাকা দিতে হবে। ছোট ছেলেটা অসুস্থ। ঘরে বাড়ন্ত চাউল। এছাড়া ঘরের চালার টিনগুলি এবার না বদলালেই নয়।

প্রতিবছর বর্ষায় আসলেই চিন্তা করে এবার বদলাবে, বর্ষা শেষ হয়ে গেলে প্রয়োজনীয়তাও যেন শেষ হয়ে যায়। এখন তো বৃষ্টি নাই, টিন বদলিয়ে কি হবে! নিজেকে সে সাত পাঁচ বুঝিয়ে পার করেছে পরপর দুটি বছর। কিন্তু এভাবে আর কতদিন এবছর বর্ষা মনেহয় আর পার করা সম্ভব হবে না। বৃষ্টি আসলে ঘরে এবং বাইরে পানি সমান সমান হয়ে যায়। এমন ঘরে বউ-বাচ্ছা নিয়ে থাকা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। চিন্তায় শুকনা মুখটা আরও পাংশু হয়ে রয়েছে তাঁর।

এমন সময় চৈতি পরিবহনের একটি গাড়ি স্ট্যান্ডে এসে থামল। তারই মত আরও ছয় সাতজন রিক্সাওয়ালা-গাড়ির দরজার সামনে গিয়ে ভিড় করলো, যাত্রী নেওয়ার জন্য।

সেও মাথায় পলিথিন বেঁধে ওই প্রতিযোগিতায় শামিল হল।

পরিশেষে একজন যাত্রী সে পেল, কিন্তু কপাল মন্দ। কাছেই দয়ালের মোড়ের এক যাত্রী। ভাড়া রফা হলো ত্রিশ টাকা।

খুব দ্রুতই যাত্রীকে দয়ালের মোড়ে পৌঁছে দিয়ে আবারো স্ট্যান্ডে ফিরে আসছিল লতিফ। মাথায় চিন্তার ঝুড়ি। আনমনে গাড়ি চালাচ্ছিল সে। দ্রুতই ফিরে আসছিল। তার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে এই বাসের আরো কোনো যাত্রী যদি রিক্সা না পেয়ে থাকে, তবে তাকে যাত্রী হিসেবে পাওয়া।

ঝমঝমে বৃষ্টিতে কাক ভেজা ভিজে গেছে সে। সেদিকে তার খেয়ালই নেই। মুক্তির মোড় পর্যন্ত আসতেই, ব্রাদার্স পেট্রোল পাম্পের পাশে মাথায় কালো একজাতীয় চাদর নাকি পলিথিন ঠিক বুঝা গেল না এ জাতীয় জিনিস দিয়ে ঘোমটার মত দেওয়া লম্বা-চওড়া এক ব্যক্তিকে ইশারা করতে দেখে রিক্সার ব্রেক কষতে বাধ্য হলো লতিফ।

রাশভারী কণ্ঠে ব্যক্তিটি জিজ্ঞাসা করল, দুর্গাপুর যাবে?

দুর্গাপুর অনেক দূরের পথ। ভাড়া নিশ্চয়ই বেশি হবে। খুশিতে মনটা চনমনে হলেও, পরক্ষণে ভাঙ্গা রাস্তার কথা চিন্তা করে। না করে দিলো লতিফ।

গম্ভীর বাবুটি আবার বলল। চলো, ভাঙ্গা রাস্তার কথা চিন্তা করছ তো, তোমাকে পুশিয়ে দেবো।

বেশি টাকার লোভে আগে-পিছে চিন্তা না করে কালো ঘোমটা দেওয়া ভদ্রলোককে যাত্রী হিসেবে উঠিয়ে নিলো লতিফ। কিছুদুর যাওয়ার পর নিজেদের মধ্যে দূরত্ব কমানোর জন্য লতিফ স্বভাবসুলভ ভাবে গম্ভীর যাত্রীকে জিজ্ঞাসা করল।

আচ্ছা আপনি দুর্গাপুরের কোথায় যাবেন? কিছুই তো বললেন না, কোথা থেকে এত রাত্রে আসলেন? দুর্গাপুর কি আপনার বাড়ি?

একটু কেশে ভদ্রলোক বললো তোমার তো দারুন বুদ্ধি হে। এত রাত্রে কেউ আত্মীয় বাড়িতে যায়?

দুর্গাপুরেই আমার বাড়ি। এক কাজে এসে নওগাঁ শহরে আটকে গিয়েছিলাম। মহাতাব উদ্দিন চৌধুরীর নাম শুনেছো? আমি ঐ বাড়িতেই যাব, ওখানেই আমি থাকি।

দুপুর রাত্রে বৃষ্টিতে ভিজে এত কষ্ট করো, শুধু অভাবে পড়লেই কি মানুষ এত কষ্ট করে।

বাকি পথটুকু লতিফ একাই বকবক করে গেছে। ভদ্রলোক আর তেমন বিশেষ কোনো কথা বলেননি।

দুর্গাপুর পৌঁছার পরেও ডান পাশে, বাম পাশে, আরেকটু সামনে। এভাবে প্রায় আরো তিন কিলোমিটার ভিতরে এক অচেনা অব্যবহৃত ধ্বংস স্তূপের মত বাড়ির সামনে এসে থামল লতিফ। জোছনার আলোতে আশেপাশে কয়েকটি কবর সাদৃশ্য স্তম্ভ দেখতে পেল সে। পাশেই একটি নাতিদীর্ঘ অশ্বত্থ গাছ।
না বলে এতদূর নিয়ে আসার জন্য লতিফের মনটা রাগে-ক্ষোভে একরকম হয়ে আছে। তাছাড়া যে গা ছমছমে পরিবেশ তারাতাড়ি এখান থেকে যেতে পারলে বাঁচে। মনে মনে তিনশত টাকার মতো ভাড়া চাইবে স্থির করে বসে আছে সে।
রাশভারী ভদ্রলোক রিক্সা থেকে নেমে হাসি দিয়ে বলল। এমন বৃষ্টিমুখর রাতে তুমি আমার যে উপকার করেছ, আমি তোমার উপরে অনেক খুশি। বলো তোমার কি চাই?
গম্ভীর লতিফ বলল আপনি আমার ভাড়াটুকুই শুধু দিন, তাহলেই আমার উপকার হয়।
ভদ্রলোক বললো নিঃসংকোচে বলতে পারো। আমি চেষ্টা করব তোমার উপকার করার।
বিনীতভাবে লতিফ বলল, আপনাকে দেখে ও কথা শুনে বড়ই পরোপকারী মনে হলো। আমার ঘরের টিন নষ্ট হয়ে গেছে। যদি সম্ভব হয় আমাকে তিন বান্ডিল টিন কেনার টাকা দিন। বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে বড়ই কষ্টে দিনোতিপাত করছি।
একথা শুনে রাসভারি লোকটি চাদরের ভেতর থেকে একটি কাপড়ের থলি বের করে লতিফের হাতে দিয়ে, পিঠে মৃদু চাপড় দিয়ে হাসতে হাসতে পোড়াবাড়ির দিকে চললেন।
লোকটা চলে যেতেই লতিফ রিক্সার নিচে চেসিজের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখা হ্যারিকেনের আলোয়, কাপড়ের পোঁটলা টি খুলল। এবং পটলার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসলো তিনটি কালো কুচকুচে মরিচা পড়া পুরনো আমলের পয়সা।
মুহূর্তেই ক্ষোভে লতিফের মুখটা বিকৃত হয়ে এক বিকৃত গালি বেরিয়ে আসে। মানুষ মানুষকে এভাবে ঠকায়। বৃষ্টিতে ভিজে ভাঙা রাস্তায় এত দূর পথ পাড়ি দিয়ে নিয়ে এসে, সুন্দর সুন্দর কথা বলে, অবশেষে ভাড়ার পরিবর্তে পুরনো অচল পয়সা দেয় কেউ? ফাজিল কোথাকার! মানুষের মধ্যে থেকে বিবেক কি একেবারেই উঠে গেল নাকি!

লতিফ দ্রুত পিছনে ফিরলো লোকটাকে ধরার জন্য। কিন্তু একি! একমুহূর্তেই লোকটি যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। আশেপাশে কোথাও লোকটির ছায়াও পর্যন্ত নেই। রাগে-দুঃখে পয়সা গুলি ছুঁড়ে ফেলে দিল সে। পরক্ষণেই ছোট্ট

ছেলে খোকনের কথা মনে পরল তার। খোকনের তো পয়সা জমানোর সখ। কি আর করা, নিয়ে যাই পয়সাগুলো ওকেই না হয় দেব।

গজগজ করতে করতে ফিরে আসার সময়, এক মসজিদের টিউবয়েলে পানি খাওয়ার জন্য থেমেছিল লতিফ। সেখানে মসজিদে ঘুমিয়ে থাকা মুয়াজ্জিন উঠে এসে তাকে জিজ্ঞাসা করল, ঐদিক কোথা থেকে আসলেন ভাই। যতদূর জানি ঐদিকে গ্রামের শেষমাথা, কোন মানুষের বসবাস নাই।

এই কথা শুনে ভয়ে মনটা দমে গেল লতিফের। মুয়াজ্জিনকে কিছু না বলে হাঁফাতে হাঁফাতে বাড়ির দিকে ছুটলো লতিফ। ঘেমে নেয়ে একসার লতিফ, প্রায় ভোর নাগাদ ফোঁস ফোঁস করতে করতে বাড়িতে এসে পৌঁছালো। বৌকে ঘুম থেকে জাগিয়ে নিজের সাথে ঘটা সারারাতের দুর্গতির কথা এক এক করে বলতে থাকে।

সব শুনে বৌ বলে, কোথায় সেই পয়সাগুলো দেখি তো।

লতিফ বলে পোঁটলা সমেত পয়সাগুলি, রিক্সার সিটের নিচে রেখেছি, দাঁড়াও নিয়ে এসে তোমাকে দেখাচ্ছি। এই বলে লতিফ রিক্সার গদির নিচ থেকে পোঁটলা টি নিয়ে, ওটা মুখে বাঁধা সুতলিটা খুলে, স্ত্রীর সামনে উপুর করে ধরলো।

হায় আল্লাহ একি! পোঁটলার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল একের পর এক টাকা। অনেকগুলি টাকা।

লতিফের তো চক্ষু চড়কগাছ! এটা কি করে সম্ভব। রাগের চোটে আমি নিজেই তো পয়সাগুলো ছুড়ে ফেলেছিলাম। পুরাতন অচল পয়সা, কিভাবে টাকায় রূপান্তর হল! আনন্দে আত্মহারা লতিফের বউ বলতে থাকল, এত দিনে আল্লাহ আমাদের দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন। এতগুলো টাকা দিয়ে আমরা আমাদের সমস্ত অভাব মিটিয়ে ফেলতে পারবো।

এবার স্বামী-স্ত্রীতে মিলে পরিকল্পনা করতে থাকলো পরদিন বাজারে গিয়ে কি কি কিনবে। লতিফ বলল, যতো কিছুই কেন বউ, আগে আমরা ঘরের টিনগুলি কিনবো তারপর বাকি সব।

পরদিন লতিফ টাকার ব্যাগ সমেত সস্ত্রীক বাজারে যায় কেনাকাটার জন্য। প্রথমেই তারা হার্ডওয়ারের দোকানে গিয়ে নয় ফিট সাইজের, আট পিস এর, তিন বান্ডেল ঢেউটিন কিনলো।

হিসাব কষে দোকানি জানালো টিনের মূল্য পনের হাজার টাকা।

এবার মূল্য পরিশোধের পালা। লতিফ যথারীতি রিক্সার গদীর নিচ থেকে টাকার পোঁটলা টি নিয়ে আসে। দোকানের টেবিলের উপরে টাকাগুলো ঢেলে

স্বামী-স্ত্রীর উভয় মিলে টাকাগুলি গুনতে শুরু করে। গণনা শেষে দেখা যায় টাকার পরিমাণ পনের হাজার টাকা যা টিনের মূল্যের সমান। অতিরিক্ত একটি টাকাও নেই। অথচ ভোরবেলা যা অজস্র টাকা মনে হয়েছিল। এবার রাগে ক্ষোভে লতিফপত্নী অগ্নিমূর্তি ধারণ করে।

বোকার হদ্দো কোথাকার! চাইলেই যখন, একটু বেশি করে চাইতে পারলে না? দোকানি নির্বাক হয়ে উভয়ের দিকে চেয়ে থাকে। লতিফ তার বৌকে শান্ত করার চেষ্টা করে। দিগুণ উত্তেজিত হয়ে ওর বউ বলতে থাকে, আমার শরীরের ভালো কাপড় নেই, কোনদিনও দামী অলঙ্কার কিনে দেওয়ার মুরোদ রাখনা, সন্তানদের মুখে ভালো খাবার তুলে দিতে পারোনা, এসব বলতে পারলেন না! উনি চেয়েছেন ঘরের টিন!

বাজারের মধ্যে আশাহত লতিফের বউ, অবুঝের মত হুলুস্থুল কাণ্ড শুরু করে। লতিফ অনেক বুঝিয়ে শুযিয়ে বউকে ঘরে আনে।

এখন লতিফের ঘরের চালে নতুন টিন উঠেছে। কিন্তু পরিবর্তে ঘর থেকে পালিয়ে গেছে শান্তি। ওর বউ ওকে প্রতিনিয়ত আবার সেখানে গিয়ে কথিত সেই মাহাতাব উদ্দিন চৌধুরী নামক রহস্যময় ব্যাক্তিটির সঙ্গে দেখা করার কথা বলতে থাকে।

লতিফ তার বৌকে বোঝানোর চেষ্টা করে। এটা ঠিক হবে না। আমাদের নসিবে যা ছিল তাই আমরা পেয়েছি। এর চেয়ে বেশি লোভ করা আমাদের উচিৎ হবে? কিন্তু নাছোড়বান্দা ওর বউ কোনোভাবেই মানতে রাজি নয়। প্রতিদিন এই বিষয় নিয়ে সংসারে অশান্তি লেগেই থাকতো।

একদিন তো বৌ তাঁকে বলেই বসলো। তুমি মাহাতাব উদ্দিন চৌধুরীর সাথে দেখা না করে বাড়িতেই আসতে পারবে না।

নিরুপায় লতিফ গতন্তর না দেখে, এক সন্ধ্যায় বেরিয়ে পরলো দুর্গাপুরের উদ্দেশ্যে।

পড়নো রাজবাড়ীটা কে পেছনে ফেলে লতিফ সেদিনের সেই চেনা পথে সামনে এগিয়ে যায়। নিশুতি এই গ্রামীণ ভাঙ্গা রাস্তাটায় তার রিক্সার খটখট শব্দ ছাড়া আশেপাশে তিন কিলোমিটারের মধ্যে কোন সারা শব্দ নাই। রাত তখন এগারোটার কিছু বেশি বাজে। এমনই এক ভয়াবহ অন্ধকারে পরিবেশে লতিফ সামান্যতম ভয়ও পায় না। ওর মনে তখন একটাই চিন্তা, কিভাবে মাহাতাব সাহেব কে পাওয়া যায়? পথিমধ্যে সেই মসজিদটায় একটু বিশ্রাম নেওয়ার জন্য বসে সে। ওকে বারান্দায় একা বসে থাকতে দেখে যথারীতি সেই মুয়াজ্জীনটা

বেরিয়ে আসে। কথা প্রসঙ্গে এখানে আসার কারণ জানতে চায়। লতিফ ও সম্পন্ন না বলে শুধুমাত্র মাহতাব উদ্দিন চৌধুরীর ব্যাপারে জানতে চায়।
এবার মুয়াজ্জিন বলেন, আপনাকে আমি ঠিকই চিনেছি ভাই। আপনি সেদিনের সেই মধ্যরাত্রে পানি খাওয়া লোকটি। এবং আপনি না বললেও আপনার এখানে আসার কারণটা কিন্তু আমি জানি। কারণ আপনিই প্রথম ব্যক্তি নন যে এত রাত্রে আমার কাছে মহাতাব উদ্দিন চৌধুরীর পরিচয় জানতে চাচ্ছেন। শুধু একটা কথা আপনাকে বলি ভাই আপনার সঙ্গে যা হয়েছে অনেকেরই এরকম অভিজ্ঞতা আছে। আপনি যা পেয়েছেন, এতেই সন্তুষ্ট থাকুন। তাতেই আপনার মঙ্গল।
এবার লতিফের মন-মানসিকতা কিছুটা বদলে যেতে থাকে। কিন্তু পরক্ষণেই তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে স্ত্রীর রক্তবরণ মুখশ্রী ও একগাদা চাহিদার ফর্দ। সে চোয়াল শক্ত করে উঠে যেতে যেতে শুধু বলে, আমি নিরুপায় রে ভাই.....
সমস্ত ভয়-ডরকে কে উপেক্ষা করে সেই অশ্বত্থ গাছটার পাশে ধ্বংসস্তূপ আকৃতি বাড়িটার অদূরে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে আজকের ভয়হীন লতিফ। রিক্সার গদীর উপরে বসে অপেক্ষা করতে থাকে মাহাতাব উদ্দিন চৌধুরীর। কিন্তু কোথায় তিনি?
অনেকটা পথ রিকশা চালিয়ে আসার পর, ক্লান্তিতে কিছুটা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল সে। কত রাত হয়েছে জানা নেই। হঠাৎ পাতায় খসখস আওয়াজ শুনে চোখ মেলে সামনে তাকায় সে। এবং মুহূর্তেই কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে দেখে, সামনে দাঁড়িয়ে আছে সেদিনের সেই কালো আলখাল্লা পরা ব্যক্তিটি। লোকটির চোখে আজকে অদ্ভুত রকমের আলো! ওর চোখের দিকে তাকালে যেন নিজের ভিতরটা দেখা যায়। দূরে কোথাও যেন অনেকগুলো শিয়াল এক নাগাড়ে ডেকেই চলেছে। পোড়া বাড়ীর ধংশস্তুপ থেকে ধোঁয়ার কুন্ডলি বেড়িয়ে চারিপাশের এই আলকাতরা মাখা অন্ধকারকে আরও ভীতিকর করে তুলেছে। লতিফ মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।ভয়ে ওর ভেতরটা যেন কুঁকড়ে যাচ্ছিল!
সেই দরাজ কণ্ঠ.... **আবার কেন এলে বাছা**....? যা দিয়েছিলাম ওতে ঢেউটিন কেনা হয়নি?
এবার কিছুটা সাহস সঞ্চয় করে লতিফ বলল হয়েছে, **কিন্তু আমার যে আরো চাই!**
রাশভারী কণ্ঠ আবার বলল কি চাই তোমার?

এবার লতিফ মনের মধ্যে সাজিয়ে রাখা সোনাদানা টাকা-পয়সার সম্পদের কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ আটকে গেল এবং নিজেকে তুচ্ছ মনে করে, সাবলীল ভাবে বলতে লাগলো **আমার শুধু শান্তি চাই, একটু শান্তি...!**

দৃঢ় কণ্ঠে ছায়ামূর্তি আবার বলল, একটু ভেবে বলো, **হয় শান্তি, নয় সম্পদ? যেকোনো একটি বেছে নিতে হবে।**

কণ্ঠে ততধিক দৃঢ়তা এনে লতিফ শান্ত কণ্ঠে বলল, **আমার শান্তিই চাই।**

অনেক আগেই রিকশার উপর থেকে নেমে সামনে দাঁড়ানো লতিফকে ছায়ামূর্তিটি বলল, তবে এসো আমার বুকের ভিতর। এই বলে রহস্যময় ছায়ামূর্তিটি লতিফকে সেই কালো চাদরে আবৃত করে ফেলল। লতিফ প্রাণপনে চিৎকার করে উঠলো। ওর গগন বিদারী আর্তনাদ ধ্বনি তরঙ্গায়িত হয়ে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল। একটু দূরে অলক্ষ্যে লতিফ এর পিছনে পিছনে এসে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকা সেই মসজিদের মুয়াজ্জিন প্রাণভয়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

পরদিন সকালে, গরুর জন্য ঘাস কাটতে আসা এলাকার কিছু ছেলে মেয়ে অজ্ঞাত এক ব্যক্তিকে সেই অশ্বত্থ গাছটার নিচে, মৃত অবস্থায় পরে থাকতে দেখতে পায়। পরবর্তীতে এলাকার লোকজন বেওয়ারিশ লাস হিসেবে সেই পোড়া বাড়িটার সামনে তাঁকে কবর দিয়ে দেয়। কালের পরিক্রমায় দুর্গাপুরের রাজবাড়ী ও তার অদূরে ধ্বংসস্তূপে হারিয়ে যাওয়া মাহাতাব উদ্দিন চৌধুরীর সাথে সাথে লতিফও সেদিন ইতিহাসের ছেঁড়া পাতায় হারিয়ে যায়। এর অনেকদিন পর রিকশার লাইসেন্স নাম্বার ধরে লতিফের পরিবারকে খুঁজে বের করা হয়। কিন্তু লতিফের কবর আর স্থানান্তরিত করা সম্ভব হয়নি।

কাজলী

শ্যাওলা পরা পিচ্ছিল বহু বছরের পুরানো পুকুর ঘাট। পুকুরের পানিতে ধৌত করা থালা বাসন গুলো ডান হাতে কোমরের সাথে ধরে, বাম হাতে ধোয়া কাপড়ের বালতি নিয়ে, সাবধানে পা টিপে টিপে উঠে আসছে দারিদ্র্যক্লিষ্ট, গ্রাম্য গৃহবধূ কাজলী। অনাদর ও অবহেলায় কুড়িতেই বুড়ি হয়ে যাওয়া কাজলীর রূপ-যৌবন এখনো কিছুটা জীর্ণশীর্ণ মলিন ভেজা কাপড় ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। মনে তার দারুন উত্তেজনা। জীবনের সবচেয়ে বড় আনন্দের খবরটি অতিকষ্টে মনের মধ্যে চেপে রেখেছে সে, আজ যা প্রকাশ করার দিন। খুব দ্রুতই বাড়িতে যাওয়ার তাড়া। এতক্ষণে হয়তো গতকাল অনেক রাত অবধি মাতলামো করা মদ্যপ স্বামী জেগে উঠেছে। ঘুম থেকে জেগেই সকালের খাবার ও কাজলী কে না দেখলে মেজাজ বিগড়ে যাবে তাঁর। খিটখিটে স্বভাবের নয়ন শুরুতে এমন ছিলনা। পিতৃহীন কাজলী বড় ভাইয়ের সংসারে বেশ আদরেই মানুষ হয়েছিল। ভাইয়ের স্বল্প সামর্থ্য ও ভাবির চরম বিরোধিতা সত্ত্বেও মেট্রিক অবধি পড়েছিল সে।

একদিন কুশাডাঙ্গা গ্রামে ঘুরতে আসে, পার্শ্ববর্তী হিজলতলি গ্রামের স্কুলমাস্টারের একমাত্র ছেলে নয়ন। কাজলী কে দেখে পছন্দ করে এবং পারিবারিকভাবে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। খোঁজ খবর নিয়ে ভাই সন্তোষজনক ফলাফল পেয়ে, বৃদ্ধ মায়ের সাথে আলোচনা করে, বেশ অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই কাজলী কে নয়নের সঙ্গে বিয়ে দেয়। ওদের বিবাহের ছয় মাসের মাথায়, স্কুল শিক্ষক শশুর একদিন আকস্মিকভাবে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। সে সময় বিকম পাস করা নয়ন, পিতার একরকম চাপে পড়েই, চাকুরীতে ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য গ্রামের বাইরে ছিল। শশুরের মৃত্যুর সাথে সাথেই কাজলীর সোনার সংসারে যেন দুর্ভেদ্য অন্ধকারের ঘনঘটা নেমে আসে।

খবর পেয়ে দ্রুতই বাড়িতে আসে নয়ন। বাবার মৃত্যুতে একদম মুষরে পরে ছেলেটি। ব্যথাতুর নয়নকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা হারিয়ে ফেলে সবাই। এভাবেই চলছিল দিন। ওই ঘটনার দেড় মাস পর একদিন হঠাৎ নয়ন যেখানে চাকরি ইন্টারভিউ দিয়েছিল, সেই গোল্ডেন ইন্সুরেন্স কোম্পানি নামক প্রতিষ্ঠান থেকে একটি চিঠি আসে। চিঠিতে তাকে জানানো হয় যে,নয়ন ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে এবং তাকে নিয়োগ প্রদান করা হচ্ছে। খুব দ্রুতই প্রতিষ্ঠানে গিয়ে কাজে যোগদান করার কথা বলা হয়েছে।

বিষয়টি মা এবং কাজলী কে জানালে, কাজলী মত দেয়, কারণ বাবাকে হারিয়ে নয়নের মানসিক অবস্থা ভালো নেই। কোন কিছুই সে চিন্তা করতে পারছে না। সারাদিন বিমর্ষ হয়ে ঘুরে বেড়ায়। এমন সময় নতুন চাকরির খবর পেয়ে কাজলী যার পর নাই খুশি হয়, কারণ নতুন কাজ, নতুন পরিবেশ পেলে কাজে ডুবে থাকবে নয়ন। এই সুযোগে বাবার কথা মন থেকে দূর করতে পারবে এবং সে মানসিকভাবে খুব ভালো থাকবে। তাছাড়া নয়নের তো আর কোনো ব্যবসা-বাণিজ্য অভিজ্ঞতাও নেই।

কিন্তু এতে বাধ সাধেন মা। উনার যুক্তি হলো নয়ন বাবার একমাত্র সন্তান। মৃত্যুর পূর্বে ওর বাবা অনেক জায়গা সম্পত্তি ও ব্যাংকে গচ্ছিত অনেক টাকা রেখে গিয়েছে। নয়নের আর কোন ভাই বোন নেই। ওকে চাকরি করতে হবে কেন? এই সম্পদ নাড়াচাড়া করে সে ইচ্ছে করলে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারে। এতে তার কোন সমস্যা হওয়ার কথা না। তাছাড়া একমাত্র ছেলে চোখের সামনে থাকবে, ছেলেকে দেখে মায়ের কলিজা জুড়াবে। তিনি কোনোভাবেই ছেলেকে অন্যত্র চাকরি করতে যাওয়ার পক্ষে মত দেন না।

শাশুড়ির কর্তৃত্বময় আচরণ ও স্বামীর অনিচ্ছার কাছে কাজলীর পালক সম মতামত ধুসর স্বচ্ছ কর্পূরের মত উবে যায়।

সেই ঘটনার তিন বছর কেটে গিয়েছে। এতদিনে বাবার গচ্ছিত সম্পদের সবগুলি টাকা ও সম্পদ হাতে আশায় বদলে গেল নয়ন। তাসের মত টাকা ওড়াতে থাকে সে। মুহূর্তের মধ্যে জুটে যায় সুযোগসন্ধানী অসংখ্য বখাটে বন্ধুর দল। সেই সাথে প্রতিটি অনৈতিক কাজে মায়ের আস্কারা। অল্প ক'দিনের ব্যবধানে আদর্শবান স্কুলশিক্ষকের সন্তান নয়ন এখন মাদক, জুয়া ও নারীতে মেতে থাকে সারাক্ষণ। চরিত্রে কালিমা লাগাতে লাগাতে একদম তলানিতে গিয়ে পৌঁছে। আর প্রতিটি উৎশৃংখল কাজের বিরোধিতা করায় কাজলী এখন নয়নের চোখের বিষ। এখন উঠতে বসতে, কথায় কথায় তাকে মৌখিক ও শারীরিক নির্যাতন করতে দ্বিধাবোধ করে না নয়ন। শাশুড়ি মা চোখের সামনে ছেলের এতসব কুকীর্তি দেখার পরেও নিষেধ প্রতিবাদ তো দূরের কথা, উল্টো কাজলী কেই দোষারোপ করে বলেন, বৌমা তুমি একটু মানিয়ে চলতে পারো না। জানই তো ছেলেটা আমার সরল সোজা। ওর বন্ধুরা ওর মাথা খেয়ে নিচ্ছে।

এখন তো মাঝেমাঝেই শাশুড়ির মুখে এমনও শোনা শোনা যায় যে, ছেলে বখাটে হওয়ার জন্য নাকি কাজলীই দায়ী। সেই-ই স্ত্রীর দায়িত্ব পালন করে, ছেলেকে ঘরে আটকে রাখতে পারেনি।

মাঝখানে জমি বিক্রির পয়সায় কিছুদিন বাজারের মধ্যে ডেকোরেটরের দোকানে বসিয়ে ব্যবসা করার চেষ্টা করেছিল নয়ন। কিন্তু অনভিজ্ঞতার কারণে তাও অল্পদিনেই লাটে উঠে। এরপর একের পর এক জমিজমা বিক্রি করে সর্বশান্ত হয়ে অবশেষে বাউন্ডুলে নয়ন এখন টেম্পু ড্রাইভার।

একদিকে নেশার টাকা সংগ্রহ করার চাপ অন্যদিকে সংসার এই দুইয়ের যাঁতাকলে পড়ে নয়ন এখন পাগল প্রায়। তাকে রসাতলে নিয়ে যাওয়া সেই বন্ধুরা এখন এক এক করে বিদায় নিয়েছে সকলে। ছিঁচকে চুরি-চামারি থেকে শুরু করে এমন কোন নিকৃষ্ট কাজ নেই যা নয়নের দ্বারা সংঘটিত হয়নি। গ্রাম্য শালিসে কতবার করে সালিশ প্রধান দের হাতে মার খেয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। সারাটা দিন কোথায় কী করে বেড়ায় তার কোনো খবর পাওয়া যায় না। মধ্যরাতে মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি ফিরে হই হুল্লোর মারপিট এখন এ বাড়ির নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এমনি এক অন্ধকারাচ্ছন্ন দিনে, কাজলীর শরীরে এক ভিন্ন রকম পরিবর্তন ভেসে ওঠে। জেগে ওঠে মাতৃত্বের চিহ্ন!

বৃষ্টি ভেজা পিচ্ছিল পথ পা টিপে টিপে অতি সাবধানে অথচ দ্রুত বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে কাজলী। শাশুড়ির ঘরের সামনে বারান্দায় উপড়ে ভেজা কাপড়ের বালতি এবং থালা-বাসন গুলি রেখে চঞ্চল মনে নিজের ঘরের দরজার পর্দা সরিয়ে বিছানায় উঁকি মারে কাজলী।

না, যে ভয় পেয়েছিল সে, তা হয়নি নয়ন এখনো ঘুমে বিভোর! ছেলেটির মুখের দিকে তাকালে বেশ মায়া হয়। চোখের সামনে প্রাণোচ্ছল স্বামী টি তার শেষ হয়ে যাচ্ছে। শত চেষ্টাতেও সে কোনভাবেই কিছু করতে পারছে না। মায়াবী মোহনীয় স্ত্রীর মহব্বতের চাহনির চেয়েও মাদকের নেশা মানুষকে এভাবে আসক্ত করতে পারে নয়নকে না দেখলে তা কোন কালেও বিশ্বাস করত না। কাজলী নয়নের শীয়রের পাশে বসে ওর মাথার চুলের মধ্যে বিলি কাটতে কাটতে কথাগুলি ভাবছিল। অজান্তেই ওর দুচোখ ভরে ওঠে অশ্রুতে। সে মুছে ফেলার আগেই টপ করে এক ফোঁটা অশ্রু নয়নের চোখের উপরে পড়ে যায়।

ঘুম ভাঙ্গে নয়নের। একরাশ বিরক্তি নিয়ে উঠে বসে সে। জানতে চায় সকাল-সকাল এতো অভিনয় এর কারণ কি। যাকে সে সকাল-সকাল বলছে সেটা যে দুপুর বারোটা সেদিকে নয়নের খেয়ালই নেই। যাহোক নারী জীবনের সবচাইতে আনন্দের খবরটি স্বলজ্জ কণ্ঠে স্বামীকে জানায় কাজলী। কিন্তু হায় অভাগী কাজলী, বিনিময় স্বামীর কাছ থেকে যে ব্যবহার সে পেল, তা কস্মিনকালেও কল্পনা করেনি। অবশ্য আনন্দে আটখানা হওয়ার মত কোন ব্যাপার যে ঘটবে, তাও সে আশা

করেনি। তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে নয়ন, চিৎকার-চেঁচামেচিতে বাড়ি মাথায় তুলল। সেই সঙ্গে যোগ দিল শাশুড়ি। নয়নের বাম হাতের এক থাপ্পড়ে মেঝেতে ছিটকে পড়ে জ্ঞান হারানোর আগ মুহূর্তে কাজলী শুধু এতটুকু শুনতে পেল, এই বাচ্চার বাবা আমি নই।এটাকে নষ্ট করে ফেলবি, না হয় তোর জীবনের মায়া ত্যাগ করবি। শাশুড়ির কর্কশ কণ্ঠে তীক্ষ্ণ কুরুচিপূর্ণ গালিগালাজ শুনতে শুনতে কান এর ভিতর উত্তপ্ত সিসা ঢেলে দেওয়ার অনুভূতি নিয়ে সন্ধ্যার কিছু পরে জ্ঞান ফিরে আসে কাজলীর। ডান গালের ঠোঁটের নিম্নাংশ কেটে গিয়ে তখনও রক্ত ঝরছে তার।

কাজলী শাশুড়ির দুই পা জড়িয়ে ধরে বলে মা আপনি আমাকে বাঁচান। আপনার ছেলেকে বুঝান। আমি কি কোন অন্যায় করেছি? আমি তো পারিনি, এই সন্তান পৃথিবীতে আসলে, হয়তো এর কারনে আপনার ছেলে পথে আসতে পারে।

অবাক বিস্ময় কাজলী প্রত্যক্ষ করে শাশুড়িও তার ছেলের মত অবলম্বন করছে। কাজলী কান্নাবিজড়িত কণ্ঠে বলে, মা আপনিও তো একজন নারী, কিভাবে পারছেন এমন পাষানের মত কথা বলতে। ছেলের প্রতি ভালোবাসায় আপনি কি অন্ধ হয়ে গেছেন? বুকে কি পাশান বেঁধেছেন? তবে শুনে রাখুন অনেক অত্যাচার নির্যাতন নিরবে মুখ বুঝে সহ্য করেছি আমি। আর নয়! আপনাদের রক্তচক্ষুকে তোয়াক্কা করি না আমি। এই সন্তান আমি পৃথিবীতে আনবোই! পিঠের উপর ছড়িয়ে থাকা তৈলহীন রুক্ষ শুষ্ক চুল গুলো সহসাই খামচে ধরে যেনতেনভাবে মাথার সাথে খোঁপা করে বেঁধে সোজা হয়ে দাঁড়ায় কাজলী। স্তম্ভিত শাশুড়ি, হা করে ওর দিকে চেয়ে থাকে। চিরকালীন নম্র লিকলিকে কঞ্চির মতো কাজলী এমন ইস্পাতকঠিন দৃঢ়তা কোথা হতে পেল! শুধুমাত্র ভাই ও ভাবীর সংসার এ বোঝা হওয়ার ভয়ে, এতদিন এমন অমানুষিক, অকথ্য নির্যাতন মুখ বুঝে সহ্য করে, শশুর বাড়ির উঠোনের মাটি কামড়ে পড়ে ছিল কাজলী। কিন্তু আজ সবকিছুকে ছাপিয়ে, বিবাহের চতুর্থ বছরের মাথায় মাতৃত্ব রক্ষার তাগিদে এক অজানা গন্তব্যের অন্ধকার পথে পা বাড়ায় বদলে যাওয়া কাজলি।

এরপর কেটে যায় অনেক বছর। হঠাৎ একদিন রাজধানী ঢাকা শহরের অদূরে উত্তরা আজমপুর এলাকার এক বিলাসবহুল শপিং কমপ্লেক্সে একটি মোবাইল কোম্পানির জাঁকজমক শোরুমের সেলসম্যান হিসেবে আকস্মিক কাজলীর দেখা পাওয়া যায়। অন্তরঙ্গ আলাপচারিতায় কথা প্রসঙ্গে, সম্পূর্ণ বদলে যাওয়া লাস্যময়ী কাজলীর কাছে জানতে চাই তার জীবনের এই আমূল পরিবর্তনের কথা এবং আজকের এই পর্যায়ে উঠে আসার বাকি কাহিনী।

কাজলী তার ভূবন মাতানো আকর্ষণীয় হাসির সাথে যা ব্যাক্ত করলো সংক্ষেপে তা এই যে, সেদিনের সেই অন্ধকার রাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে কাজলী প্রথমে ভেবেছিলো ভাইয়ের বাড়িতে যাবে কিন্তু পরক্ষণেই দুঃখিনী মায়ের দুঃখ দুর্দশার কথা চিন্তা করে সোজা সান্তাহার রেল স্টেশনে গিয়ে উপস্থিত হয়। এরপর আগে পিছে না ভেবে দিনাজপুর থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী "দ্রুতযান এক্সপ্রেস" ট্রেনে উঠে বসে। যাত্রাপথে সেই ট্রেনেই পরিচয় হয় মানুষরূপী ফেরেশতা সমতুল্য রহমান চাচার সঙ্গে। কাজলীর জীবনের সমস্ত ঘটনা শুনে রোড এক্সিডেন্ট এ সংসারের সর্বহারা আরেক মানুষ, রহমান সাহেব সেদিন কাজলী কে নিজের মেয়ে বলে সম্বোধন করে। বর্তমানে কাজলি এই রহমান চাচার আশ্রয়ে তার আজমপুর এর বাসায় রয়েছে। তার সন্তানের বয়স এখন চার বছর। সারাদিন রহমান চাচার সঙ্গে মেতে থাকে। ভিন্ন একটি চিন্তাধারা থেকে রহমান চাচার একরকম অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই মোবাইল ফোন শোরুম এর সেলসম্যানের চাকরিটা সে করছে।

গত এক বছর আগে ছেলের হাত ধরে হিজলতলি গ্রামে আরেকবার তার শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে উঠেছিল কাজলী। গিয়ে দেখে সেখানকার এক করুণ চিত্র। নয়নকে পুলিশ ছিনতাই এর অপরাধে গ্রেফতার করেছে। শাশুড়ি মায়ের দিন যাচ্ছে খেয়ে না খেয়ে, তাকে দেখবার কেউ নেই। বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন রোগে শোকে ছিন্নভিন্ন অবস্থা। কাজলী কে কাছে পেয়ে দুই হাত জোড় করে ক্ষমা ভিক্ষা করে। সবকিছু ভুলে কাজলী শাশুড়িকে বুকে জড়িয়ে ধরে। যতটা সম্ভব সেবা-শুশ্রূষার পর নগদ কিছু টাকা হাতে দিয়ে, খুব দ্রুতই ঢাকায় ফিরে আসে সে। এরপর রহমান চাচার সহযোগিতায় নয়নকে জামিনে ছাড়িয়ে নিয়ে মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করে। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসা চলছে তার। ডাক্তারদের আশ্বাস অনুযায়ী খুব সম্ভব আগামী ছয় মাসের মধ্যে নয়ন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

অবশেষে আশীর্বাদ সূচক কাজলী'র মাথায় হাত বুলিয়ে, শপিং কমপ্লেক্স থেকে বেরিয়ে আসলাম। নিজেকে শুনিয়েই যেন বললাম, কি বিচিত্র মানুষের জীবন!

তথাপি...?

আজকের আকাশটা মনে হচ্ছে একটু বেশি রকমের পরিষ্কার। সূর্যের তাপ কোন রকম বাধাহীনভাবে সরাসরি ত্বকে এসে পড়ছে। আকাশটাও কেমন যেন নিস্প্রাণ। কোথাও সাদাকালো মেঘের ছিঁটেফোঁটাও নেই। মেয়েটা অবশ্য বাড়ি থেকে বের হওয়ার আগে ছাতা নেয়ার কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু কি মনে করে জানি নেওয়া হয়নি আর। ঘর্মক্লান্ত বিরক্ত আমিনুদ্দিন বার কয়েক আকাশের দিকে চেয়ে, জোরে জোরে পা চালালো। জলতেষ্টায় তার বুকের ছাতি ফেটে যাওয়ার জোগাড়। পা জোড়াও যেন আর কথা শুনছে না তাঁর। কোথাও একটু বসা দরকার।পঞ্চাশোর্ধ আমিনুদ্দিন পরক্ষণেই আবার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে, না.. বসলে চলবে না। যেকোনো মূল্যে বড়বাবুকে আজকে তার পেতেই হবে।

গত দু'মাস আগে চাকরিটা চলে যাওয়ার পর থেকেই পাওনা টাকা গুলির জন্য, বাড়ি থেকে অফিস, অফিস থেকে বড়বাবুর বাসা হয়ে ঘুরতে ঘুরতে সে বড়ই ক্লান্ত। নতুন একাউন্টস অফিসারটি বড়ই ত্যাদড়! প্রতিদিন নতুন নতুন অজুহাত। আজ বড়বাবু নেই, কাল অফিসে অডিট চলছে, পরশু বড়বাবু দেশের বাহিরে ইত্যাদি, যেন অযুহাতের পাহাড়। সবকিছু মিলিয়ে আমিনুদ্দিন ক্লান্ত,বিধ্বস্ত। সাইকেলটাও নষ্ট হয়ে পড়ে আছে। পিছনের চাকার রিংটা বুঝি এবার না বদলালেই নয়।

না.. আজ আর অফিসে নয়। আজ তো ছুটির দিন, নিশ্চিত বড়বাবুকে বাসায় পাওয়া যাবে। শেষ চেষ্টা হিসেবে আজ না হয় বাসায় যাই।

আমিনুদ্দিন যথারীতি বাড়ির সদর দরজার দারোয়ানের কাছে শুনতে পেল আজকেও স্যার বাসায় নেই। ব্যার্থ মনোরথে হতাশ আমিনুদ্দিন বাড়ির পথে পা চালালো। কিছুদূর যেতেই পেছন থেকে দারোয়ানের চিৎকার শুনতে পেল, আমিনুদ্দিন ভাই....একটু এদিকে আসুন, বেগম সাহেবা আপনাকে ভিতরে ডেকেছেন।

ইতস্ত আমিনুদ্দিন এক বুক আশা নিয়ে ছোট্ট দোতলা বাড়িটার নিচতলার বসার ঘরের সোফার এক কোনে জড়সড় হয়ে বসে আছে। এই ঘরটা অনেক চাকচিক্যময় আসবাবে ভরা। বিভিন্ন আঙ্গিকে সাজানো দৃষ্টিনন্দন ঝকঝকে শোপিসগুলি সম্ভবত বিদেশ থেকে আনা।

একটু পরেই নীলিমা নামের পঁয়ত্রিশোর্ধ বেগম সাহেবার আগমন। খুব মায়াবী আর শান্ত কণ্ঠে আমিনুদ্দিন কে জিজ্ঞাসা করলেন,

চাচা উপরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আপনাকে এর আগেও বেশ কয়েকদিন এই বাসায় আসতে দেখেছি। আপনাকে চিনতে পারলাম না। আপনি কার কাছে আসেন?
ইতস্তত কাটিয়ে আমিনুদ্দিন এবার বলতে শুরু করল, মা আমি এক বড়ই অভাগা মানুষ। সাহেবের অফিসে গত ছয় বছর যাবত অফিস সহকারির কাজ করে আসছি, হঠাৎ গত দু'মাস আগে কোম্পানির শৃঙ্খলা ভঙ্গের অপরাধে আমার চাকরিটা চলে যায়। জানি আমি কোন শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিনি। গত ছয় বছরে আমার নামে অফিসের কারোরই কোন অভিযোগ নাই। তারপরও আমি সব মেনে নিয়েছি।
আপনি কোন লিখিত অভিযোগ করেননি?
না..মা, অভিযোগ কারো কাছে করব? একসময়ের সবচাইতে প্রিয় এই আমাকে, বড়বাবু তো কথা বলার সুযোগই দিচ্ছেন না।
আসলে আমার চাকরিটা থেকে মন উঠে গেছে। তাছাড়া শরীরটাও ইদানিং সায় দিচ্ছেনা। দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন উর্দ্ধগতির এই বাজারে যা বেতন পাই, তা দিয়ে বাসা ভাড়া করে থেকে, সংসার চালানোটা বড়ই দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার শেষ মাসের বেতন, প্রফিডেন্ট ফান্ড ও গ্রাচুয়িটির পাওনা টাকা কয়টা পেলে, পরিবার-পরিজনদের কে নিয়ে গ্রামে চলে যেতাম। জীবনের শেষের কয়টা দিন না হয় সেখানেই কাটিয়ে দিলাম।
সব শুনে বেগম সাহেবা বললেন, আপনার টাকাটা যাতে তাড়াতাড়ি পেতে পারেন সে ব্যবস্থা আমি করব।আপনি সাবধানে থাকবেন।
ওই বাড়ি থেকে ফিরে আসার সময় দরজা পর্যন্ত বেগম সাহেবা এগিয়ে দিতে এলেন। আমিনুদ্দিনের করুন চাহুনি দেখে নীলমির চোখ অশ্রু সজল হলো।
কি মনে করে হঠাৎ আমিনুদ্দিন খুব করুণ চোখে বেগম সাহেবার মুখের দিকে চেয়ে, মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, মা জননী তোমার মুখে আমার মেয়ে ময়নার ছবি দেখতে পাই। হঠাৎ যেন আমিনুদ্দিন বেশ কিছুটা সাহসী হয়ে বলতে শুরু করলো....
সম্ভবত আমার চাকরি চলে যাওয়ার কারণটা আমি জানি মা। নিজের মেয়ে মনে করে বলছি স্বামীকে আগলে রেখো মা জননী। বড়বাবু হয়তো ভুল পথে পা বাড়িয়েছেন। সবকিছু ঠিক ঠাকই চলছিলো। কিন্তু গত ছয় মাস আগে জুনিয়র এক্সিকিউটিভ হিসেবে শিখা ম্যাডাম অফিসে জয়েন করার পর থেকেই সব কিছু যেনো এলোমেলো হয়ে গেল। খুব দ্রুতই সবার মন জয় করে নেওয়া শিখা ম্যাডাম এবার বড় বাবুর দিকে নজর দিলেন। কারণে-অকারণে বড়বাবুর অফিসের মধ্যে ঢোকা, বিনা কারণে তার সঙ্গে লেগে থাকাটা যেনো নিত্যনৈমত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো। সবাই সব কিছু জানলেও কিন্তু কারোরই টু শব্দটি করার সাহস ছিল না। এমন ভাবে দিন চলছিল।

ঐদিন মেকারের দোকানের সাইকেল ঠিক করতে দিয়েছিলাম তাই নির্দিষ্ট সময়ের একটু আগেই সেদিন অফিস থেকে বের হয়ে যাই। বাড়ির দিকে অনেকটা পথ আসার পর হঠাৎ মনে পড়ে, টিফিন বক্স টা অফিসে ফেলে এসেছি। না নিয়ে এলে আগামীকালকে দুপুরের খাবার নিয়ে যেতে পারবো না। অগত্যা সাইকেল ঘুড়িয়ে আবার অফিসের দিকে রওনা দিলাম। অফিসে এসে দেখি গেইট এখনো খোলা। বড়বাবুর ঘরের লাইট জ্বলছে। ভাবলাম অফিসে কাজের খুব চাপ চলছে হয়তো। ক্লান্ত স্যারকে এ সময় এক কাপ চা করে দিলে মন্দ হয় না। চা নিয়ে বড়বাবুর রুমে গিয়ে, স্যার আর শিখা ম্যাডাম কে যে অবস্থায় পেয়েছিলাম তা মুখে প্রকাশ করতে পারবেনা মা জননী! সেদিনের পর থেকে যে কয়দিন অফিসে ছিলাম, আমি আর বড়বাবুর সামনে পরিনি। ভালো থেকো যাই মা....

ফিরে আসার সময় আমিনুদ্দিন, দারোয়ানকে মোবাইলে কার সঙ্গে কথা বলতে দেখল। তাই তাকে বিরক্ত না করে, গেইট পার হয়ে, সোজা বাড়ির পথে চলল। কিছুদূর যেতেই আমিনুদ্দিন একটা কালো ল্যান্ড রোভারকে প্রচন্ড গতিতে রাস্তার একবারে পাশ ঘেঁষে দ্রুতই তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে, আতঙ্কে পিচঢালা রাস্তা থেকে নেমে অনেকটা মাটির কাঁচা রাস্তায় নেমে এলো। কিন্তু একি! গাড়িটাও যে কাঁচা রাস্তায় নেমে সোজা তার দিকে এগিয়ে আসছে.....আ..আ... রক্তাক্ত আমিনুদ্দিন জ্ঞান হারানোর আগে অস্পষ্ট চোখে গাড়ির লুকিং গ্লাসে বড়বাবু কুটিল হাসি দেখতে পেল।

নির্লিপ্ত নীলিমা হক, উদাস চোখে আকাশের দিকে চেয়ে বারান্দায় চেয়ারে বসা। আমিনুদ্দিন নামের ওই লোকটা তার মনে অশান্তির আগুন নতুন করে জ্বালিয়ে দিয়েছেন আজ। এক ঝটকায় তাকে নিয়ে গেছেন ছয় বছর পেছনে। সেদিনের নীলিমা হক ছিলেন আজকের অফিসের নতুন এক্সেকিউটিভ শিখা ম্যাডামের স্থলে। ক্যারিয়ারের উন্নতির নেশা সেদিন তাকেও পাগল করে দিয়েছিল। এক পর্যায়ে হোসেন মিয়া নামক সেদিনের অফিস সহকারীর চোখে বিব্রতকর অবস্থায় ধরা পড়ার পর, যখন সম্বিত ফিরে এলো, সেদিন নিজেকে দেখলেন বড়বাবুর মোহনীয়, কোমণীয় জটিল কূটিল জালে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়েছেন।

আত্মসম্মান রক্ষার্থে বিয়ের কথা বললে বড়বাবু সেদিন আশ্বস্ত করেছিলেন। পূর্বের সংসারের দৃষ্টির আড়ালে এই বাড়িতেই তাকে আজ অবধি রক্ষিতা করে রেখেছেন। যেখানে সব আছে কিন্তু নেই কোনো স্বীকৃতি, নেই মাতৃত্বের অধিকার। এ এক অন্যরকম জীবন!

সেদিন অফিসের ওদের কুকীর্তির বলি হয়ে, গরিব অফিস সহকারী হোসেন মিয়াকে রাস্তায় সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ দিতে হয়েছিল। হঠাৎ নীলিমা হক অজানা শঙ্কায় কেঁপে উঠলেন! আজকে আবার কি সেদিনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে?

আজকের অফিস সহকারী আমিনুদ্দিন এর মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে কি আরেক নীলিমা হকের জন্ম হবে? নাকি ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে.....?
আমিনুদ্দিনের মৃত্যুর খবর নীলিমাকে যেনো পাথরের মতো স্তব্ধ করে দেয়। অতীতের ছায়া তার বর্তমানকে গ্রাস করে। সে বুঝতে পারে, নীরবতা আর দুর্বলতা তাকে শুধু ধ্বংসের দিকেই ঠেলে দেয়। এবার রুখে দাঁড়ানোর পালা। অতীতের শিকল ভেঙে বেরিয়ে আসার পালা।
পরের দিন, নীলিমা থানায় গিয়ে আমিনুদ্দিনের মৃত্যুর ঘটনায় সাক্ষ্য দেয়। বড়বাবুর কুকীর্তি এবং অফিসে তার ক্ষমতার অপব্যবহারের কথা প্রকাশ করে। সমাজের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, ক্ষমতার দম্ভে কিভাবে একটা জীবন শেষ হয়ে যায়। কিভাবে একজন অসহায় মানুষ ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হয়।
তার এই সাহসী পদক্ষেপ সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করে। মানুষ রুখে দাঁড়ায়। অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলে। সমাজের চোখে চোখ রেখে নীলিমা বলে, "আর নয়। আর কোনো আমিনুদ্দিনের জীবন যেন এভাবে না শেষ হয়। আজ থেকে শুরু হোক এক নতুন লড়াই। এক নতুন যুগের সূচনা।"
এই সমাপ্তিতে নীলিমা শুধু একজন দর্শক নয়, একজন সক্রিয় যোদ্ধা। তার লড়াই যেন সমাজের সকল নিপীড়িত মানুষের লড়াই হয়ে ওঠে। একটা নতুন যুগের সূচনা করে....

কিন্তু না, সেদিন নীলিমা জিততে পারেননি। শিখার অশ্রু আড়াল করা মিথ্যা সাক্ষ্য এবং বড় বাবুর অঢেল টাকা ও প্রভাব প্রতিপত্তির কাছে ওর সমস্ত সাহসী প্রতিবাদ মুখ থুবড়ে পড়েছিল। প্রথমে ওকে সন্তানের শোকে কাতর এবং পরে পাগল আখ্যা দেয়া হয়েছিল।
অবশেষে পরাজয়ের গ্লানি বুকে নিয়ে এই ঘৃণেধরা সমাজের কলংকিত মুখে থুথু ছিটিয়ে, সবকিছু ছেড়েছুড়ে এক অজানার উদ্দেশ্যে পা বাড়ায় নীলিমা। সাথে নিয়ে যায় আমিনউদ্দিনের অকস্মাৎ এতিম হওয়া সেই ছোট্ট মেয়েটিকে। তিন কুলে যার কেউ ছিলনা।